দৈনিক
ইত্তেফাক
তাং ০৭-০২-২০০৯

ভাষা

প্রমিত বানানে বাংলা লিখন

ইয়াসমীন আরা লেখা

একটি জাতির জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে ভাষা। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা ভাষা তাই আমাদের অহংকারের বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আমাদের দায়িত্বও অনেক বেশি। এই দায়িত্বের প্রকাশ ঘটাতে হবে আমাদের বচনে, লিখনে তথা সমগ্র জীবনাচারণ পদ্ধতিতে।

বাংলা ভাষার মৌখিক ও লিখিত দু'টি রূপ রয়েছে। মৌখিক রূপ হচ্ছে মুখে উচ্চারিত ভাষা। মানুষ শুধু মুখের ভাষা আবিষ্কার করেই থেমে থাকেনি। মুখের ভাষাকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্যে আবিষ্কার করেছে লিখন পদ্ধতি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কাজটি সম্পন্ন করে লিখন পদ্ধতি। লিখন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ভাষা অন্যের নিকট মূর্ত হয়ে ওঠে। এর মাধ্যমে কোন বিষয়বস্তু, ঘটনা স্থায়ী রূপ পায় এবং যুগ যুগ ধরে অপরাপর জনগোষ্ঠী তা থেকে জ্ঞান অর্জন করে। তাই বাংলাভাষার লিখন রূপটি প্রমিত ও নিয়মসিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। দুঃখজনকভাবে আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি বই-পুস্তকসহ এবং প্রচার মাধ্যমে ভুল বানানের ছড়াছড়ি। এটা কোন মতেই কাম্য নয়।

বানান ভুলের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বানানের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বানান মূলত স্বরধ্বনির পর ব্যঞ্জনধ্বনির বা ব্যঞ্জনধ্বনির পর স্বরধ্বনির যোগ করার রীতি বা লিখিত সংবিধি। কিন্তু পৃথিবীর কোন ভাষাতেই উচ্চারণ অনুসারে সব বানান লেখা হয় না। বাংলা ভাষায় বহু তৎসম শব্দ থাকলেও অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের পরিমাণও কম নয়। এছাড়া রয়েছে প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ, সন্ধি, সমাস ইত্যাদির সহযোগে গঠিত নানা মিশ্র শব্দ। এর ফলে বাংলা বানানের সমতা বিধান সম্ভব হয়নি। এ অসুবিধা ও অসঙ্গতি দূর করার জন্যে বিশ শতকে প্রথমে বিশ্বভারতী ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৮ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং ১৯৯৪ সালে বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বানান রীতি প্রণীত হয়। বাংলা একাডেমি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বানান রীতি দু'টির মধ্যে সমতা বিধানের জন্যে ২০০৫ সালে বাংলা বানান সমতা বিধান কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি উক্ত দু'টি বানান রীতির সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে একটি বানান রীতি গঠন করে। যা পাঠকদের সুবিধার জন্য তুলে ধরা হলো

১। রেফ (র্)-এর পর কোথাও (তৎসম, অর্ধতৎসম সকল শব্দে) ব্যাঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন- কর্জ, কর্ম, পূর্ব, ফর্দ, শর্ত, সূর্য।

২। সন্ধিতে (তৎসম শব্দে) প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের পূর্বে ম্ স্থান ং (অনুস্বার) লেখা হবে। যেমন অহংকার (অহম্+কার), ভয়ংকর, সংগীত।

অন্যান্য ক্ষেত্রে (সন্ধিবদ্ধ নয় বলে) ক খ গ ঘ এর ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্যবর্ণ যুক্ত করার জন্য সর্বত্র ঙ (উয়ো) লেখা হবে। যেমন অঙক, আকাঙ্ক্ষা, লঙ্ঘন, শঙ্খ, সঙ্গে।

তৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র) শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ঐ নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে ং (অনুস্বার) ব্যবহৃত হবে। যেমন- জং, পালং, রং, শিং, সং। এক্ষেত্রে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তিযুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরবর্ণ থাকলে ঙ (উয়ো) হবে। যেমন বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। 'বাংলা' ও 'বাংলাদেশ' শব্দ দু'টি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তা-ই অনুশ্রিত হয়েছে।

৩। হস্ চিহ্ন ও ঊর্ধ্বকমা, যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন- উচিত, করব, চট, চার শ, ঝরঝর, দু জন, কোন, বলে। তবে উচ্চারণ বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকলে প্রয়োজনমত হস্ চিহ্ন দেয়া যেতে পারে। যেমন ওয়াক্‌ফ চল্, বল্ (অনুজ্ঞা), শেল্‌ফ।

৪। যে সব তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর (ই, ঈ, উ, ঊ) অভিধানসিদ্ধ, সে ক্ষেত্রে এবং অতৎসম (তদ্ভব দেশি, বিদেশি মিশ্র) শব্দের বানানের শুধু হ্রস্বস্বর (ই ি, উ ু) প্রযুক্ত হবে। যেমন অঙগুরি, খঞ্জনি, চিৎকার, জানুয়ারী, পাখি, পুব, বাড়ি, শুটিং সরকারি।

৫। কয়েকটি স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন কিঙকরী, গাভী, পিশাচী, মানবী, রানী, হরিণী।

৬। ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার থাকবে। যেমন আরবি, ইংরেজি, জাপানি, ফরাসি, বাঙালি, হিন্দি।

৭। বিশেষণ বাচক 'আলি'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন- চৈতালি, পূবালি, বর্ণালি, মিতালি, রূপালি, সোনালি।

৮। পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'তে ই-কার হবে। যেমন- বইটি, মেয়েটি, লোকটি।

৯। সমোচ্চারিত শব্দে অর্থভেদ বোঝাবার জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন- কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম/ বিশেষণ); তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ); নিচ (নিম্ন অর্থে), নীচ (হীন অর্থে); কুল (বংশ অর্থে), কূল (তীর অর্থে)।

১০। ক্ষ-বিশিষ্ট সকল তৎসম শব্দে ক্ষ অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন অক্ষয়, ক্ষীর, ক্ষুধা, ক্ষুর, ক্ষেত্র, পক্ষ।

তবে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে খ দিয়ে লেখা হবে। যেমন খিদে, খুদ, খুর (গবাদি পশুর পায়ের অস্থিময় নিম্নভাগ) খেত (ফসলের মাঠ), খেপা।

১১। ব্যঞ্জনবর্ণে উ-কার (ু) ঊ-কার (ূ) এবং ঋ-কারের (ৃ) একাধিক রূপ পরিহার করে এই কারচিহ্নগুলো বর্ণের নীচে যুক্ত করা হবে। যেমন রুদ্র, রুক, শুভ, হৃদয়।

তবে প্রাথমিক স্তরের বাংলা পাঠ্য পুস্তকের সংশ্লিষ্ট 'পাঠশিখি' অংশে-কার চিহ্নের পুরাতন রূপটিও উল্লেখ করতে হবে। যেমন রু=রু, রৃ=রৃ, শু=শু, হৃ-হৃ ইত্যাদি।

১২। যুক্ত ব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্যে প্রথম বর্ণে রূপ যথাসম্ভব ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন অঙ্ক, শঙ্খ, সঙেগ, স্পষ্ট।

১৩। লেখক ও কবি নিজেদের নামে বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবেই লেখা হবে।

আমরা জানি লিখিত যে কোন বিষয়বস্তুই মানুষের উপর স্থায়ী রেখাপাত করে। তাছাড়া বই পুস্তক, সংবাদপত্র, এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনায় ভুল বানানে লিখিত বিষয় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে গেঁথে যায় এবং তাদের শিখনের সূত্রপাত হয় ভুলের মধ্যে দিয়ে। এ ধারা পরিণত বয়সেও অব্যাহত থাকে। ভুল বানানে বাংলা লেখা বাংলাভাষাকে অবমাননা করারই সামিল। তাই বই পুস্তকসহ যাবতীয় প্রচার মাধ্যমে বাংলা বানান সমতা বিধান কমিটি প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করবে এটাই কাম্য। তাহলেই বাংলাভাষা ইতিহাসের স্থায়ী মর্যাদার আসনে অভিসিক্ত হতে পারবে।

[লেখক: ডীন, স্কুল অফ এডুকেশন এ্যান্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, উত্তরা ইউনির্ভাসিটি]